দশম অধ্যায়

সাহবাগে বাসন্তী পূজায়

বাসন্তী পূজার পূর্বের দুর্গা পূজায় এ শরীরের এক খেয়াল হইল যে তিন দিন যাবৎ সূর্য উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত কাহারো সঙ্গে কথা বলিবে না। সাহবাগে সারাদিন নাচঘরের সংলগ্ন একটি কোঠায় পড়িয়া থাকিত। রাত্রে সকলের সঙ্গে দেখা করিত। এভাবে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পার হইল। দশমীর দিন ১০/১১টার সময়ে নিকটে এক পুকুরে স্নান করিয়া থাকার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সে সময়ে নাচঘরে বহু লোক ছিল, এ শরীর যখন পুকুর হইতে স্নান করিয়া তাহাদের পাশ দিয়া ঘরে গেল, তখন এ শরীরকে কেহই দেখিতে পাইল না। পরে যখন স্নানের কথা শুনিল, তখন জিজ্ঞাসা করিল — কখন বাহির হইলে, কখন স্নান করিলে, কখনই বা আবার ঘরে গেলে? তাহাদের বলিলাম — আমি ত যাইতে আসিতে তোমাদিগকে দেখিয়াছি। আমার যদি খেয়াল হইত যে আমাকে কেহ দেখিবে না, তাহা হইলে তাহাই হইত। কেহ কেহ আবার বলিল তোমাকে কখন বড় দেখায়, কখন ছোট দেখায় — ইহার কারণ কি? এইসব যোগ-বিভূতি সাধকের ত হয়ই। এ শরীরের ত আপনা হইতে নিজের খেয়ালে খেলিয়া যায়।

একবার শশাঙ্কবাবুর গাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরী যাইতেছি, গাড়ীর ভিতর অনেক লোক, মা এ শরীরকে কোলে নিয়া বসিল। খেয়াল হইল যে এ শরীরের ভার যেন তার গায়ে না লাগে। মায়ের কোলে বসিয়াছিলাম। মা বার বারই বলে, তুমি যে বসিয়াছ আমার গায়েই লাগে না। আমি ত সেইরূপ কিছু বুঝি না। যখন গাড়ী হইতে নামিলাম, তখন ধপ্ করিয়া শরীরটা মাটিতে বসিয়া পড়িল। তখন আমি বলিলাম, পূর্বে যে লোক আকাশ মার্গে চলিতে পারিত, তাহার প্রমাণ এই। গাড়ীতে যেমন একেবারে ভারশূন্য হইয়া বসিয়াছিল। দেখ না ঘুড়িটি এত কাগজ ও বড় বড় কাঠি নিয়া কেমন শূন্যের উপরে ঘোরে। ঐ ক্রিয়ায় সব সম্ভব।

দশমীর দিন সন্ধ্যার একটু পরে পুকুরে গিয়াছি, এমন সময়ে কি খেয়াল হইল জলে নামিয়া গেলাম, কেমন একটা ভাব হইল যে জল যেন আমায় ডাকিতেছে, পরে শরীরটা অবশ হইয়া গেল এবং সকলে ধরিয়া উপরে তুলিয়া আনিল। এ ভাবটি কয়েক দিন চলিল — 'জলে ডাকে, জলে ডাকে' বলিয়া জলের কাছে চলিয়া যাইতাম। আগুন সম্বন্ধেও ঐরূপ হইত। আমিও জল ও আগুনের সঙ্গে সেই সেই রূপ হইয়া যাইতাম। গাছপালা, জীবজন্তু, যাহা কিছু দৃশ্যে আসে এবং কানে শুনি — এ শরীর রূপ গুণ নিয়া তাহাই।

সাধকের যখন স্বকীয় দেহভাব-রূপ বুদ্ধি পরিবর্তিত হইতে থাকে তখন সে দেখিতে পায় যে ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নাই যাহাতে সে নাই। প্রথম প্রথম সে একটি লক্ষ্য ধরিয়া অর্থাৎ জল, আগুন, আকাশ, বাতাস, মাটি এ সবের কোন একটি নিয়া, এই ভাবটি খেলিতে পারে। তখন প্রথম দিকে তাহাকে কখনো কখনো অস্থির দেখা যাইতে পারে এবং কখনো স্থির, অটলও দেখা যাইতে পারে। আবার এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে দেখিতে পায় নিজের ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড, আবার ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু সবটাতেই সে অক্ষুণ্ণভাবে — ইহাও প্রকাশ হয়। আলাদা আলাদা দৃষ্টির আর কোন প্রশ্ন থাকে না। ঐ আর কি। এইগুলিও কিন্তু বিশেষ কথা। এই শরীর যখন সাধনার খেলাগুলি খেলিয়াছিল, এই সব ভাবগুলি স্বভাবতই ত প্রকাশ ছিল।

জ্যোতিষ ও নিরঞ্জনের প্রার্থনা

বাসন্তী পূজার পর একদিন সন্ধ্যায় জোৎস্না রাত্রে জ্যোতিষ ও নিরঞ্জন আমার নিকট দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। আমি যতদিন ঢাকা ছিলাম, ততদিন, প্রথম কয়েকদিন ছাড়া, জ্যোতিষকে আমার নিকট সাহবাগে কি আশ্রমে বসিতে দেখি নাই। নিরঞ্জন একদিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল — মা! আমরা শীঘ্র মরিয়া যেন আপনার আশ্রমে ব্রহ্মচারী হইতে পারি — আমাদের এই প্রার্থনা, আশীর্বাদ করুন। আমি জ্যোতিষের দিকে চাহিয়া বলিলাম — কেন এ শরীরে কি হইতে পারিবি না? ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মচারী অর্থ সঠিক কি? ভাব ও কর্মই ত আসল। তখন কেহ কিছু বলিল না। পরে জ্যোতিষ

যে এতবড় অসুখ হইতে বাঁচিয়া উঠিল — ইহাই তাহার পুনর্জন্ম জানিবে।

সেইদিন অমাবস্যা ছিল। নিরঞ্জনের বাড়ীতে কীর্তন ও ভোগাদি হইল। কীর্তনে শরীরটা কেমন হইয়া গিয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় কীর্তন শেষ হইল। বহু লোক, ভোগ নিবেদন হইলে প্রসাদ নিবার জন্য সকলকে বসাইয়া দিতে বলিলাম। মথুরবাবু বলিল — মা! যাহা আয়োজন তাহাতে ত এত লোকের কুলাইবে না। তাহাকে বলা হইল — আগে ত একসঙ্গে বসাইয়া দাও। তখন শরীরের খেয়াল হইল যে যতক্ষণ পরিবেশন দেখিব ততক্ষণ কিছুতে কম হইতে পারিবে না। পরে দেখা গেল সকলের খাওয়া হইলে আরো কিছু রহিয়া গেল।

বিন্ধ্যাচলের সাপের কথা

একদিন নগেন দত্ত এ শরীরকে বিন্ধ্যাচলের সাপের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। ঐ সম্বন্ধে বলিতে বলিতে, যেমন বিশেষ আপন জনের অভাবে কান্না পায়, ঠিক সে সাপের জন্য তেমন একটা ভাব প্রকাশ হইল। তখনই হাসিয়া বলিলাম, শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

নিরঞ্জনের বাড়ীতে প্রতি শনিবার কীর্তন হইত। কীর্তনে সেখানে গিয়াছি। তাহার স্ত্রীর তখন খুব অসুখ। প্রায়ই যাইয়া তাহাকে দেখিতাম। সেই দিন দোতালার উপর তাহার কাছে একটা বালিশে হেলান দিয়া পা মেলিয়া বসিয়াছি, ইহার মধ্যে হঠাৎ খেয়াল হইল, পায়ের কাছে যেন সাপ। আমি কিছু বলি না, ইতিমধ্যে কে বলিয়া উঠিল, সে কোঠার পরের পরের কোঠায় সাপ। এ সময় আমি কীর্তনে যাইব বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছি, ভোলানাথ আমার আগে। ইহার মধ্যে দেখি একটি কাল সরু সাপ ভোলানাথের পায়ের কাছে। এ সময়ে কেমন একটা খেয়াল হইল, ভোলানাথকে ছেলেমানুষের মত সরাইয়া আনিলাম ও সাপটি আমার পায়ের বুড়া আঙ্গুলের চাপে রহিল। পরে সেটি আঁকা বাঁকা হইয়া সিঁড়ির নীচে গিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। ইহার মধ্যে অনেকে আসিল, জিজ্ঞাসা করে — সাপটি মারিব? হাসিয়া বলিলাম, যদি পার তবে দেখ। কে আসিয়া একটি লাঠি দিয়া চাপা দিল, ভাবিল সাপের

গায়ের মাঝখানে চাপা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে দেখা গেল, সাপটি নাই। বাহির ভিতর সিঁড়িতে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে, কিন্তু সাপটিকে আর কেহ দেখিতে পাইল না — অদৃশ্য। যখনই এ শরীরের সাপের কথা খেয়াল হইত, তখনই দিন বা রাত্রি হউক যে কোন সময়ে একটি সাপের রূপে এ শরীরের সাথে প্রায় দেখা হইয়া যাইত।

বিদ্যাকূট হইতে রওনা হইয়া সাহবাগের পথে আমরা নৌকায় উঠিলাম। বাহিরে বসিয়াছি। বীরেনও আমার নিকট বসিয়াছে। নৌকা খাল ছাড়িয়া বিলে যাইয়া পড়িল। দেখি কি একটি সাপ জলের ভিতর আমার দিকে চাহিতে চাহিতে আমার বরাবর, নৌকা যত যায়, সাপটি টেরাভাবে প্রায় দশ হাত দূরে দূরে চলিতেছে। এই রূপে বেশ কতদূর চলিল। আমারও চোখের পলক নাই। সাপটির দিকে চাহিয়া আছি। আর ঐটিও এক লক্ষ্যে আমার দিকে আসিতেছে। যখন নৌকার কিনারা দিয়া আমার কাছাকাছি আসিল তখন মাঝি দাঁড় দিয়া এক আঘাত দিল, সাপটি আমাদের নৌকার নীচ দিয়া, পাশে আরও একখানা নৌকা ছিল, তাহার তলা দিয়া চলিয়া গেল। মাঝি বলিল — আমার ভয় হইয়াছিল পাছে মায়ের গায়ে আসিয়া উঠে। বীরেন জিজ্ঞাসা করিল — এইটি কি? এ শরীর বলিল — দেখিতেছিলাম, একজন মহাপুরুষ, তাঁহার সহিত একটি শিষ্য আমাদের নিকট হইতে ১০ হাত দূরে দূরে এতক্ষণ ছিল। এইমাত্র অদৃশ্য হইল। পরে আসিয়া স্টীমারে উঠিলাম। এই শরীরটা আগাগোড়াই এলান অবশ ছিল। সকলে ধরাধরি করিয়া সাহবাগে লইয়া আসিয়াছিল।

মরণীর ফাঁড়া

বাসন্তী পূজার সময় ভোলানাথের বড় বোন (সীতানাথ কুশারীর স্ত্রী) ও তাহার বাড়ীর সকলে আসে। তাহারা পরেও কিছুদিন সাহবাগে ছিল। তাহার একটি ছেলে। তাহার স্ত্রী অন্তঃসত্বা। এক-দিন বৌটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে — যেই একটি সন্তান বড় হয়, তখন আর একটি সন্তান হইলে, পূর্বেরটি মারা যায়, এই হইতে দুইটি এরূপ মারা গিয়াছে। মরণী এখন এক বছর দশ মাসের হইয়াছে, আর

একটি হইবে। এ অবস্থায় মরণীকে আপনাকে দিলাম, মরে বাঁচে যাহা হয় করিবেন। সেই হইতে মরণী সাহবাগে থাকে। বৌটির আরো একটি মেয়ে মারা যাইয়া পরে একটি ছেলে হইলে তাহার ঠাকুরমা বলিল উহাকে আশ্রমে নিয়া নামকরণ করিব ও প্রসাদ মুখে দেওয়াইব। তাহাই করিয়াছিল। সে ছেলেটি এখনো বাঁচিয়া আছে।

পাওলদিয়া গ্রামে মা

একবার যোগেশবাবু তাহার দেশের বাড়ী পাওলাদিয়া নিবার প্রস্তাব করিল। বলিল — আমার মায়ের অসুখ। জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। অসাড়ভাবে পড়িয়া আছে। তাঁহার মুক্তির জন্য একটি কালীপূজা করার ইচ্ছা। আপনারা নিশ্চয়ই যাইবেন। আমরা গেলাম। যোগেশবাবু আমাকে দেখাইয়া ভোলানাথকে বলে যে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ভোলানাথ জোর করিলে এ শরীর বলিল — আর কোন দিন পূজার কথা এ শরীরকে বলিবে না বল। বলিল — আচ্ছা। এইবার কর।

পুরোহিত পূজার সব ঠিক করিলে এ শরীর যাইয়া পূজায় বসিল। শরীরের আপনভাবে পূজাদি হইয়া গেল। ইহার ভিতর যোগেশবাবু একবার পূজা দেখিতে গেলে, এ শরীরকে সেখানে দেখিতে পাইল না। কেবল একখানি কাপড় আসনের উপর পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হইল। ভাবিয়াছিল যে আমি হয়ত বা অন্যত্র গিয়াছি। পরে যখন শুনিল যে এ শরীর পূজার আসনেই ছিল তখন অবাক।

যোগেশবাবুর মা'র শ্রাদ্ধের সময় আমরা পাওলদিয়া উপস্থিত ছিলাম। কীর্তন আরম্ভ করিলে এ শরীরের অবস্থার পরিবর্তন হইল। কীর্তনের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে পাশে একটি মুসলমানকে দেখিয়া মুখে আল্লার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামের মত আরো কি কি বাহির হইতে লাগিল। সে মুসলমানটিও এ শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম করিতে লাগিল। সে পরে বলিল — মা'র মুখে যেইরূপ আল্লার নাম হইয়াছিল আমরা চেষ্টা করিয়াও এইরূপ আনিতে পারি না। পরে ঐ মুসলমানটি বলিয়াছিল সেইদিন আমার যেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল, এইরূপ আর জীবনে হয় নাই, হইবেও না।

পরে ভ্রমর ও আরো ২/৩টি মেয়েকে সারারাত্রি কীর্তন করিবার কথা বলিলাম। তাহারা তাহাই করিল। এই কীর্তন একদিন অহোরাত্র চলিয়াছিল। কীর্তনের পর এ শরীরের কথায় যোগেশবাবু সব কীর্তনিয়াদের ধূপ নিয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

যোগ-বিভূতি ও স্বভাব-বিভূতি

ঐ সময় এ শরীরের কিরূপে খেয়ালে এক ভাব ছিল যে নদীতে জলের ঢেউ দেখিলে খেয়াল হইত, আমি এক একটি ঢেউ। দেখিতে দেখিতে শরীরটা গড়াইতে থাকিত। পাওলদিয়া যাইতে ঐ ভাব হইল। শরীরের নড়াচড়াতে নৌকা ঠিক রাখিতে পারে না। পরে পাড় ঘেঁসিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। নৌকা হইতে উলটিয়া জলে পড়িতে চাই, শরীরে এত শক্তি যে কাহারও ধরিয়া রাখা কঠিন হইয়াছিল।

কীর্তনে যেমন শরীরের অবস্থা কেমন হইয়া যাইত, জল, আগুন, ও বাতাস দেখিলেও তেমন হইত — আমিই বাতাস, জল ও আগুন। আবার কখনো গাছ ফুল ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে আমি তাহাই হইয়া যাইতাম। এইরকম ভাব অনেকদিন চলিয়াছিল। সেই সময় কোন কোন দিন একটু স্থিরভাবে, আমি কোথাও থাকিয়া, দেখিতাম ও বুঝিতাম যে জল, অগ্নি, গাছ, পশুপাখী, মাটি, পাথর ইত্যাদি বিশেষ দৃশ্যাদির কি গুণ, কি স্বভাব, কি ভাবে তাহাদের গতাগতি হয় এবং আমিও তদ্রূপ। কোন ধ্বনি শুনিলেও বোধ হইত আমিই সেই ধ্বনি। ঝটকা বাতাস দেখিলে কাপড়ের মত শরীরটাও উঠিয়া আনন্দের সহিত এক অস্বাভাবিক ভাবের প্রকাশ হইয়া বা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে যাইত। পরে আপনিই স্থির হইত। কোন কোন দিন এই ভাব লইয়া শরীরটা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াও থাকিত।

কীর্তন আরম্ভ হইলে সর্বাঙ্গের যে অবস্থা হইত তাহাও এই রকম। নাম কীর্তন শরীরের ভিতরে ও বাহিরে খেলা করিত। উপাসকের নাম করার লক্ষ্য হইতেছে — নিজেই নামময় হইয়া যাওয়া, যেমন ধ্যানের উদ্দেশ্য নিজেই ধ্যেয় হওয়া।

সাধকের যোগবলে কত কি হইতে পারে। কাগজের ঘুড়ি যেমন একমাত্র সুতার অবলম্বনে বাতাসে উড়ে, তেমন যোগীর

শরীরও শ্বাসের যোগসূত্রের গতি ধরিয়াও শূন্যে উঠা, সূক্ষ্ম হওয়া, বৃহৎ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া অনেক রকম খেলা তাহার মধ্যে প্রকাশ পায়। সাধারণের এইসব বুঝা কঠিন। যেমন পণ্ডিত না হইলে পাণ্ডিত্যের মর্ম বুঝিতে পারে না। যোগবিভূতি উদয় হইয়া আপনা হইতে স্বভাবে যাহা নিত্য আছে তাহা প্রকাশ না পাইলে সাধক স্ব-ইচ্ছায় কখনো খেলিবার চেষ্টা করিতে পারে না। সাধকের সাধন ফলে যে যোগবিভূতি হয় তাহা ফল-স্বরূপ আর অভাবের প্রাপ্তি রূপ কিনা। আর যেখানে স্বভাব-বিভূতি সেইখানে এই কথা নয়।

বদ্রীনারায়ণ যার দর্শন উদ্দেশ্য, তাহার যেমন দীর্ঘ রাস্তার মনোরম দৃশ্যাদিতে মুগ্ধ না হইয়া গন্তব্য পথে চলিতে হয়, তদ্রূপ সাধনার চরম সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত লক্ষ্যটি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা আবশ্যক।

মায়ের নিকট আসা ও যাওয়া

এটা সত্য জানিস্ তোদের দৃষ্টিতে এই শরীরের নিকট হইতে যাহারা সরিয়া গেল, তাহাদের সঙ্গে যতটুকু সময়ের জন্য দরকার তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য এই ভাবে ততটুকু সময়ই মাত্র থাকিতে পারে। আবার এই শরীরের নিকট হইতে যাইতে হইলে এমন কোন উপলক্ষ্য সৃষ্টি হইয়া পড়ে যাহাতে নিজেই কোন কারণ দেখাইয়া চলিয়া যায়। অবশ্য এই শরীরের তীব্র খেয়াল হইলে আর কিছুই দাঁড়ায় না। কিন্তু এই শরীরের ত নিকট বা দূর বলিয়া কোন কথা নাই। এই শরীরের যে সকলের জন্য সর্বত্র সব সময়ই সমান।

গিরিডিতে মা

আমরা কলিকাতা হইতে প্রথম বিন্ধ্যাচল পরে গিরিডি যাই। তখন জ্যোতিষ সেখানে অসুস্থ অবস্থায় ছিল। গিরিডিতে কিছু-দিন থাকি ও পরেশনাথ পাহাড় দেখিয়া আসি। গিরিডিতে একটি নদী ছিল। একদিন সেখানে বেড়াইতে গিয়া দেখি একটি

পাহাড়ী স্ত্রীলোক নদীর ধারে কাপড় কাচিতেছে। আমার কেমন এক ভাব হইল, তাহার কাপড় কাচিয়া দিব। আমি কাপড় লইতে চাহিলাম। সে মনে করিল, বোধ হয় পাগল, তাই ডাকিয়া বলিতে লাগিল — পাগল পাগল! সামলাও সামলাও! আমি কাপড় ছাড়িয়া দিয়া তাহার নিকট বসিয়া হাসিতেছি। তাহার ভাব যেন অন্য রকম হইয়া গেল। সে বলে — তুমি সর, না হইলে কাপড়ের জল তোমার গায়ে লাগিবে। তাহাকে বলিলাম — তুমি তোমার কাজ কর। কাজের সময় বাজে কথা বলিতে নাই, বসিয়া থাকিতে নাই। কিন্তু সে আমার দিকে চাহিয়াই থাকে। তাহার কাপড় কাচা আর হয় না। আমাকে কত কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরে আমি যখন উঠিয়া চলিয়া আসি, পিছন ফিরিয়া দেখি, মেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। পাহাড়ী মেয়েদের সঙ্গে এই জাতীয় আরো অনেক খেলা ও কথাবার্তা হইল।